**†kvKven AvM÷ উপলক্ষ্যে বিশেষ নিবন্ধ**

**১৫ আগস্ট: নেপথ্য জানতে কমিশন চাই**

মনজুরুল আহসান বুলবুল

দাবিটি অনেক দিনের। বিষয়টি জরুরি, ইতিহাসের স্বার্থেই।

কবিরা কি অন্তর্যামী হন? দেশের তখ&তে তখন লেবাস পাল্টে সেনা শাসক। জাতির জনকের খুনে রাঙ্গা বাংলায় ঘাতকদের উল্লাস। ১৬ জুলাই ১৯৭৮ এক তরুন ছড়াকার লিখেন :’ রক্তঝরার অভিষেকে বসেছিলে তখ&তে/ তোমার মরণ হবেই বাবা/ এমনি ধারার রক্তে’।

মাত্র তিন বছরের মাথায় ছড়ার ছন্দ সত্য প্রমাণিত হল। ১৯৮১ তে উল্টে গেল তখ&ত। রক্তের অভিষেকে যিনি তখতে বসেছিলেন রক্তেই তার পরিসমাপ্তি। কিন্তু সুস্পষ্ঠভাবে জানা হয়না, এই ক্ষমতায় যাওয়ার রক্তের সিঁড়িটি তৈরির ক্ষেত্রে নেপথ্যে কার কি ভূমিকা ছিল।

পদ্মায় মেঘনায় অনেক জল গড়ায়। জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়।সময় লাগে প্রায়১২ বছর। কিছু খুনির ফাঁসি হয়েছে, কিছু খুনি পালিয়ে আছে। কেউ কেউ এমন বলেন, এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের মধ্য দিয়ে জাতি দায় মুক্ত হয়েছে। আমি বলি, শেখ মুজিবকে হত্যার মধ্য দিয়ে জাতি যে অপরাধ করছে তা’ থেকে এই জাতির কোনদিন মুক্তি নেই। মুজিব হত্যার পাপের গ্লাণি এই জাতিকে বয়ে বেড়াতে হবে অনাদিকাল। তবুও, খুনের বিচারটাতো হয়েছে। কিন্তু সেই বিচারটাও কি পুরোপুরি হয়েছে? জবাব হচ্ছে : ‘না’। প্রকাশ্যে যাদের দেখি, সেই খুনিদের বিচার হয়েছে কিন্তু এই হত্যা ও যড়যন্ত্রের নেপথ্যের কুশীলবদের বিচার আজও হয়নি। এমনকি প্রামাণিক সত্যি দিয়ে তাদের দায়ও নিরূপন করা হয়নি।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় মাননীয় বিচারপতিগণের পর্যবেক্ষণ: খেন্দকার মোশতাক আহমেদের কুমিল্লার দাউদকান্দির বাড়ি ও কুমিল্লার বার্ড থেকে ষড়যন্ত্রের শুরু। এরই ধারাবাহিকতায় পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ড। হত্যাকান্ডটি যথেষ্ট পরিকল্পনা ভিত্তিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রের চেহারা স্পষ্ট হয়, সেনানিবাসের বালুর ঘাটে। পঁচাত্তরের মার্চে যে ষড়যন্ত্রের শুরু, তার চূড়ান্ত পরিণতি আগস্টে মোশতাক আহমেদের মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে।

রায়ে এক সন্মানিত বিচারপতি বলেছেন : ষড়যন্ত্রের অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকলেই হবে যে, কোনো ব্যক্তির কার্যক্রম, বিবৃতি ও লেখা অপরাধ সংগঠনে ষড়যন্ত্র করেছে। কোনো ব্যক্তি কথা বা কাজের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে পারে। সকল ষড়যন্ত্রকারীকে অভিন্ন উদ্দেশ্যে একমত হতে হবে। আরেক সন্মাণিত বিচারপতি বলেন, দন্ডবিধির ৩৪ ধারায় অভিন্ন ইচ্ছার উপাদান হলো কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অপরাধমূলক কাজ করার জন্য কতিপয় ব্যক্তির মনের মিল। অভিমতে আরও বলা হয়, – – আমরা কখনোই নিশ্চিতভাবে জানব না, দন্ডিতরা ছাড়া আর কে বঙ্গবন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের হত্যাকান্ডে জড়িত ছিল। তাই এ মামলার সাক্ষ্য- প্রমাণ সতর্কতার সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

এ সকল অভিমত অনুসরণ করেই কয়েকটি খন্ড চিত্রে খুঁজে দেখার চেষ্টা ; দণ্ডিতরা ছাড়াও এই হত্যকাণ্ডের নেপথ্যে কারা, কিভাবে জড়িত। কাদের ’অভিন্ন ইচ্ছার মনের মিল’ অপরাধটি সংঘটনে ভূমিকা রেখেছে।

সাংবাদিক এ. এল. খতিব তার বিখ্যাত’ হু কিলড মুজিব’ বইয়ে লিখছেন : [১৯৭৫ এর ১৫আগস্ট সকালে] রেডিও স্টেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে মোশতাকের ভাষনের লিখিত কপি বিতরণ করা হয়। তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ ভাষনের কপিটি পড়ে তার প্রশংসা করেন। জবাবে মোশতাক বলেন: ’আপনার কি মনে হয় এ ভাষনটি একদিনে লিখা হয়েছে’?

যে প্রশ্নের জবাব জানা জরুরি: কবে থেকে এই ভাষণের খসড়া প্রণয়ন শুরু হয়েছিল? কারা এই খসড়া প্রণয়ণের সাথে জড়িত? এই ভাষণের পরিকল্পনা আর ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা একই সূত্রে গাঁথা, সন্দেহ নেই।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার কয়েকজন সাক্ষীর বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরা যাক। কি বলছেন তারা, কার বা কাদের নাম বলছেন, সেদিকে নজর দেয়া জরুরি ।

লে. কর্নেল (অব.) আবদুল হামিদ (তখন ঢাকার স্টেশন কমান্ডার ছিলেন): ১৪ আগস্ট বিকেলে জেনারেল জিয়াউর রহমান, জেনারেল মামুন, কর্নেল খোরশেদ ও আমি টেনিস খেলছিলাম। তখন আমি চাকরিচ্যুত মেজর ডালিম ও মেজর নূরকে টেনিস কোর্টের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখি।.. জেনারেল সফিউল্লাহ আমাকে বলেন: এরা চাকরিচ্যুত জুনিয়র অফিসার, এরা কেন টেনিস খেলতে আসে? আমাকে তিনি বলেন, “এদের মানা করে দেবেন, এখানে যেন এরা না আসে।” খেলা শেষে আমি মেজর নূরকে জিজ্ঞাসা করলাম, “তোমরা কার অনুমতি নিয়ে এখানে খেলতে আসো?” জবাবে নূর জানায়, জেনারেল জিয়ার অনুমতি নিয়ে তারা এখানে খেলতে আসে।

প্রশ্ন : একজন ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিশ্চয়ই সেনানিবাসের সাধারণ নিয়ম জানেন। চাকুরীচ্যুতদের সাথে তার কিইবা সখ্য? কেন তিনি এদেরকে সেনানিবাসে খেলতে যাওয়ার অনুমতি দেন?

কর্নেল (অব.) শাফায়েত জামিল (৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার): [১৫ আগষ্ট সকালে] আমি দ্রুত ইউনিফরম পরে মেজর হাফেজসহ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের দিকে রওনা দিই। পথে জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসায় যাই। ঘটনা শোনার পর তিনি (জিয়া) বললেন, ‘সো হোয়াট, প্রেসিডেন্ট ইজ কিলড; ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ দেয়ার, আপ হোল্ড দ্য কনস্টিটিউশন।’

জাতির জনকের হত্যার খবর শুনে, একজন নির্বিকার ডেপুটি চীফ অব স্টাফের সংবিধান রক্ষার এই নির্দেশনা কি এতটাই সহজভাবে নেয়ার বিষয়?

মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন আহম্মেদ (ডিজিএফআই ঢাকা ডিটাচমেন্টের ওসি ছিলেন): ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর একটি কর্মসূচি পাই। ডিজিএফআই থেকে আমাকে বঙ্গবন্ধুর পারসোনাল বডিগার্ড হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।------ ১৪ আগস্ট দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক লাইব্রেরি এলাকায় কয়েকটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

কারা সেদিন এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল? তার সাথে ১৫ আগস্টের ঘটনার যোগসূত্রই বা কি?

জিয়াউদ্দিন বলছেন : আমি সেদিন [১৫ আগস্ট] সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে যাই। দেখতে পাই রাষ্ট্রপতির রুমে বসে খন্দকার মোশতাক, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, জেনারেল সফিউল্লাহ, জেনারেল জিয়াউর রহমান, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, এয়ার এবং নেভি চিফদ্বয়, মেজর ডালিম, মেজর শাহরিয়ার, মেজর রশিদ, মেজর ফারুক, মেজর নূর, মেজর মহিউদ্দিন (ল্যান্সার), মেজর আজিজ পাশা আলোচনারত। এই সময় বিভিন্ন দেশের রেডিও মনিটরিং নিউজগুলি খন্দকার মোশতাকের কাছে এনে দেওয়া হয়। তিনি সবাইকে পড়ে শোনান যে, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর আধঘণ্টা হতে এক ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তান সরকার মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। এ সংবাদ শোনার পর মেজর ফারুক, মেজর রশিদ ও মেজর ডালিমকে উল্লসিত ও গৌরবান্বিত মনে হচ্ছিল।

এই উল্লাসের সূত্র ধরেই দেশের বাইরের কুশীলবদের চেহারা উন্মোচন খুবই সহজ ।

মেজর জেনারেল (অব.) সফিউল্লাহ (সেনাপ্রধান): ‘১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল আমাকে চিফ অব আর্মি স্টাফ হিসেবে নিয়োগাগ দেওয়া হয়। জিয়াউর রহমানকে টেলিফোনে আমার দায়িত্ব পাওয়া ও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপের বিস্তারিত জানাই। জিয়া তখন বলেন, ‘ওকে সফিউল্লাহ। গুড বাই।’--- ‘আমি যখনই কোনো অফিসারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে ব্যবস্থা নিয়েছি, তখন ওই সব অফিসার জেনারেল জিয়ার নিকট শেল্টার নিযেছে।’

একজন চীফ অব স্টাফের সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে যাদেরকে ডেপুটি শেল্টার দিচ্ছেন, সেটিও কি কোন বড় চক্রান্তের আভাস নয় ? চীফের কাছে শাস্তি পাওয়া কাউকে শেল্টার দেয়াতো সেনা শৃঙ্খলারও পরিপন্থী ।

লে কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমানের জবানবন্দি: ... তৎকালীন ডেপুটি চিফ অব আর্মি স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আমার বাসায় হেঁটে আসতেন। তিনি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতেন এবং এক সময় বলছিলেন, “তোমরা ট্যাংকটুংক ছাড়া দেশের আর খবরাখবর রাখো কী?” আমি বলি, দেখতেছিতো দেশে অনেক উল্টা-সিধা কাজ চলছে। আলাপের মাধ্যমে আমাকে ইন্সটিগেট করে বলেছিলেন, “দেশ বাঁচানোর জন্য একটা কিছু করা দরকার।” --- এ নিয়ে মেজর রশীদের সঙ্গে দেশের অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে আলাপ আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, একমাত্র শেখ মুজিবকে ক্যান্টনমেন্টে এনে তাঁকে দিয়ে পরিবর্তন করা ছাড়া দেশে পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। এ ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আলাপ করার সিদ্ধান্ত হয়। এপ্রিল মাসের এক রাত্রে তার বাসায় আমি যাই। -- সাজেশন চাইলে তিনি [জিয়া] বলেন, “আমি কী করতে পারি, তোমরা করতে পারলে কিছু করো।” --- রশীদ পরে জিয়া ও খন্দকার মোশতাক আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মেজর রশিদ, ডালিম ও খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে আলোচনা করে যে, বাকশালের পতন ঘটাতে হবে এবং প্রয়োজনে শেখ মুজিবকে হত্যা করতে হবে, নইলে দেশ ও জাতি বাঁচবে না। যৌক্তিকভাবে আমিও ধারণাকে সমর্থন করি। খন্দকার রশীদ জানায় যে, শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারলে জিয়াও আমাদের সমর্থন দেবে। ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট রাতে মিলিটারি ফার্মে নাইট ট্রেনিংয়ের সময় কো-অর্ডিনেশন মিটিং করে ১৫ আগস্ট ভোরে চূড়ান্ত অ্যাকশনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৫ আগস্ট ঘটনার পর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে চিফ অব আর্মি স্টাফ করার বিষয়ে সাইফুর রহমানের বাড়িতে মিটিং হয়। জিয়া, রশিদ ও সাইফুর রহমান মিটিং করেন। পরে জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট হবে, সাইফুর ও রশীদ মন্ত্রী হবে, ওই উদ্দেশ্যে জিয়াউর রহমানকে চিফ অব আর্মি স্টাফ করা হয়।

এই সাক্ষ্য থেকে কি স্পষ্ট হয় না যে, মূল খুনিদের নেপথ্যে কে, কিভাবে কাজ করেছে? দেশ বাঁচানোর নামে একটা কিছু করা এবং তার কে কি পেতে চান সেই বাটোয়ারার চিত্রওতো স্পষ্ট ।

লে. কর্নেল খন্দকার আবদুর রশীদের স্ত্রী জোবায়দা রশীদের জবানবন্দি: মেজর ফারুক জেনারেল জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করত ছোটবেলা থেকেই। একদিন রাতে মেজর ফারুক জিয়ার বাসা থেকে ফিরে আমার স্বামীকে জানায় যে, সরকার পরিবর্তন হলে জিয়া প্রেসিডেন্ট হতে চায়। জিয়া নাকি বলে “ইফ ইট ইজ এ সাকসেস দেন কাম টু মি। ইফ ইট ইজ অ্যা ফেইলার দেন ডু নট ইনভলব মি। শেখ মুজিবকে জীবিত রেখে সরকার পরিবর্তন সম্ভব নয়।” এর কদিন পর মেজর ফারুক আমার বাসায় এসে রশীদকে বলে যে, জিয়া বলেছে, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব খুঁজতে হবে যে দায়িত্ব নিতে পারবে। সে মোতাবেক রশীদ খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে যোগাযোগ করে । ১৫ আগস্ট বিকেলে বঙ্গভবনে জেনারেল জিয়াউর রহমান রশীদের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল যাতে তাঁকে চিফ অব আর্মি করা হয়। ১৬ অথবা ১৭ তারিখ সাইফুর রহমানের গুলশানের বাসায় সাইফুর রহমান, আমার স্বামী ও জিয়ার উপস্থিতিতে জিয়াকে চিফ অব আর্মি স্টাফ করার বিষয় ঠিক হয়।

কুশীলবদের কার কি ভূমিকা সেটি বুঝতে আর কিছু কি বাকি থাকে?

তাহের উদ্দিন ঠাকুর (বঙ্গবন্ধুর সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালরে ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী): ১৯৭৫ সালের মে বা জুনের প্রথম দিকে ঢাকার গাজীপুর সালনা হাইস্কুলে ঢাকা বিভাগীয় স্বনির্ভর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয। সালনাতে মোশতাক সাহেব সেনা অফিসারদের জিজ্ঞাসা করেন, “তোমাদের আন্দোলনের অবস্থা কী?” জবাবে তারা জানায় যে, “বস সবকিছুর ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আমরা তাঁর প্রতিনিধি। -- ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট খন্দকার মোশতাক বলেন, এ সপ্তাহে ব্রিগেডিয়ার জিয়া দুইবার এসেছিলেন। সে এবং তার লোকেরা তাড়াতাড়ি কিছু একটা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন।

জানা দরকার :’বস’টি কে? একজন ব্রিগেডিয়ার কেন তার সাথে দুইবার দেখা করতে গিয়েছিলেন? তাড়াতাড়ি কিছু করার জন্য কার বা কাদের এত তাড়া?

সীমিত পরিসরে কয়েকটি খন্ডচিত্র বিশ্লেষনে যা’ বের হয়ে আসলো, তাতে পরিস্কার, ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ডটি একটি রাতের ঘটনামাত্র নয়, কয়েকজন ঘাতকের কাজমাত্র নয়। নেপথ্যে আছেন বহু কুশীলব। দেশে ও দেশের বাইরে। দেশি ও বিদেশি।

এতো গেল খুনিদের বিচারের সময়কার কথা। যদি দৃষ্টি দেই একটু আগে। ইতিহাস সাক্ষী দিচ্ছে : ১৫ আগস্টের নৃশংসতম হত্যাকান্ডের বিচার করা যাবেনা বলে খুনী মোশতাক একটি অধ্যাদেশ জারি করে ১৯৭৫ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর। এটিই সেই কুখ্যাত’ ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ’। ১৯৭৯ সালের ৬ই এপ্রিল এই অধ্যাদেশটিকে সংবিধানের অংশ করে নেন সে সময়কার ’উর্দিখোলা’ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। এখানেই শেষ নয়: ১৯৯৬ সালের ১২ই নভেম্বর যখন জাতীয় সংসদে কুখ্যাত ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হলো তার বিরুদ্ধে রিট করেছিলো খুনী কর্ণেল সৈয়দ ফারুক রহমানের মা মাহমুদা রহমান ও আরেক খুনি কর্নেল শাহরিয়ার রশীদ খান। এই ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের সময় বি এন পি ও জামাত সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেছিলো। জাতীয় পার্টির এম পি এন কে আলম চৌধুরী ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের আগে জনমত যাচাই করার প্রস্তাব করে।

দেখা যাচ্ছে: খুনি মোশতাকের সাথে হত্যা পূর্ববর্তী ষড়যন্ত্র, হত্যা পরবর্তী পদ-পদবী ও শেষে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রাপ্তি, খুনের বিচার না করাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তি, সংসদ থেকে ওয়াক আউট এবং বছরের পর বছর বিচার বিলম্বিত করার প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি বা দলের ভূমিকা সবই খুব স্পষ্ট ।

১৯৮০ সনের ১লা আগস্ট সেই তরুন ছড়াকার আবার বলছেন: ‘পালাবে কোথায়? কি দিয়ে মোড়াবে, বসে থাকা অই তখতো/ তোমার গায়ে, ছোপ ছোপ অই জনক খুনের রক্ত/ থু থু দিই আজ, অভিশাপ দিই, তোর বংশের গায়ে/ জনম জনম ফাঁসি চাই তোর, জনক খুনের দায়ে’। এই থু থু বর্ষণ চলছেই।

১৫ আগস্টের ঘটনায় প্রত্যক্ষ কয়েকজন খুনির সাজা হয়েছো। কিন্তু দেশের ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকান্ডের নেপথ্যের সব কুশীলবদের আনতে হবে প্রকাশ্যে। এমনকি তারা যদি মারাও গিয়ে থাকেন, ইতিহাসের সত্যির খাতিরে তাদের দায় ও অবস্থান নিরূপন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন একটি জাতীয় কমিশন গঠন। আজ এটিই জরুরি দাবি ।

#

লেখক : সাংবাদিক